এই সময়
সংবাদপত্র

ছোট পরিবারের সন্তান সমস্যা বলবে কাকে, প্রশ্ন ডাক্তারদের

মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য

লালবাজারে আবেশের মা — এই সময়

১৪ বছরের ঝকঝকে ছেলে। নামী বেসরকারি স্কুলের ছাত্র। স্কুলের টেবিলটেনিস চ্যাম্পিয়ন। পরীক্ষার খাতায় ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর। সমস্যা একটাই, মাঝেমধ্যেই সে মারধর করে মাকে। মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে ধরা পড়ল, চাইল্ডহুড অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত ছেলেটি।

সদ্য পনেরোয় পা দেওয়া মেয়েটার বাঁ হাত দেখে শিউরে উঠেছিলেন খোদ চিকিৎসকও। ব্লেড বা ধারালো কোনও অস্ত্রের আঘাতে কবজি থেকে কনুইয়ের ভিতরের অংশটা ফালাফালা। কে হাত কেটেছে? জানতে চাওয়ায় নামী গার্লস স্কুলের ক্লাস নাইনের ছাত্রী অবলীলায় জানিয়েছিল, 'আমিই কেটেছি।' কেন? বাবা-মা আইফোন-৬ কিনে দিতে রাজি হননি। না, আত্মহত্যা করতে নয়, বাবা-মা যাতে তার আব্দার মানতে বাধ্য হন, সে জন্যই এত কাণ্ড করেছিল ওই কিশোরী!

শহরের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এবং মনোবিদদের চেম্বারে প্রতি দিন 'অ্যাডোলোসেন্ট কেস'-এর ভিড় যে ভাবে বাড়ছে, উপরের উদাহরণ দু'টি সেই হিমশৈলের চূড়ামাত্র। শিশু-মনোরোগ বিশেষজ্ঞ সৌমেন দত্ত বলছেন, 'আমরা বলে থাকি, একজন শিশুর জন্য 'ওয়ান অ্যাটাচমেন্ট ফিগার' থাকা খুব প্রয়োজন, যাঁর কাছে যে কোনও সমস্যায় নির্ভয়ে যাওয়া যায়। আগে বাড়িতে বাবা-মা ব্যস্ত থাকলেও সেই অ্যাটাচমেন্ট ফিগার কম পড়ত না। এখন নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি হয়ে যাওয়ায়, ছেলেমেয়েদের জন্য সেই ফিগারটাই গড়ে উঠছে না। ফলে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে নানা রকম আচরণগত অস্বাভাবিকতা দেখা যাচ্ছে।' কেমন সেগুলো? যেমন, মৌলালির বাসিন্দা ক্লাস এইটের এক ছাত্র সর্বক্ষণ কেশে চলত। মেডিসিন, চেস্টমেডিসিন, পালমনোলজিস্ট— একে একে সব ডাক্তার হার মানার পর মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে ছেলেটিকে দেখাতে এনেছিলেন বাবা-মা। ছেলেটির চিকিৎসক, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ সাগ্নিক মুখোপাধ্যায় জানান, 'ছেলেটির প্রাইভেট টিউটর ওকে মারধর করত। কর্মব্যস্ত বাবা-মার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ক্রমাগত কেশে যেত সে। কিছু ওষধ এবং সেই প্রাইভেট টিউটরকে বদল করার পরই স্বাভাবিক হয়ে যায় ও।'

আবার অনেক ক্ষেত্রে বাড়ির বাইরেও 'অ্যাটাচমেন্ট ফিগার' খুঁজতে শুরু করে বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছনো কিশোর-কিশোরীরা। যেমন, নামকরা এক স্কুলের ক্লাস ফাইভের এক ছাত্রের মুখে আচমকাই শোনা যাচ্ছিল অশ্রাব্য গালিগালাজ। উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের বাবা-মা দুশ্চিন্তায় পড়ে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের দ্বারস্থ হন। সৌমেনবাবু বলেন, 'পাড়ার দাদাগোছের কিছু লোকের সঙ্গে ছেলেটির বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, যাদের সঙ্গে ওই অ্যাটাচমেন্টটা খুঁজে পেত ছেলেটা। ওদের সঙ্গে থেকে খারাপ ভাষাগুলো শিখে গিয়েছিল ও।' কখনও কখনও সেই অ্যাটাচমেন্ট খুঁজতে অনলাইনে 'পার্টনার' খুঁজতেও মরিয়া হয়ে উঠছে ছেলেমেয়েরা। এর ফলে খুব কম সময়ে একাধিক সম্পর্কেও জড়িয়ে পড়ছে তারা। 'ক্ষণিকের জন্য কাউকে ভালো লাগছে, আবার কিছু দিন পরই তার ব্যাপারে 'বোর' হয়ে যাচ্ছে। অনেক সময়েই তা ডিপ্রেশনও ডেকে আনছে,' জানান মনোরোগ বিশেষজ্ঞ সুবীর হাজরা চৌধুরী।

সাইবার স্পেস আর ভার্চুয়াল জগতের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে যাওয়াও অনেক ক্ষেত্রে মানসিক সমস্যার জন্ম দিচ্ছে ছেলেমেয়েদের মধ্যে। ইনস্টিটিউট অফ সাইকিয়াট্রির অধিকর্তা প্রদীপ সাহা জানান, 'ভিডিয়ো গেমে বা সিনেমায় ভায়োলেন্স দেখে, সেই ভায়োলেন্স রপ্ত করে নেওয়ার প্রবণতা আজকালকার বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়েদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশি। যাঁদের এ সবে বেশি এক্সপোজার, তাঁদের তত সমস্যা বেশি দেখা যায়।' অপরাধপ্রবণতাও এ সবের ফলে বেশ উর্ধ্বমুখী বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা।

এই অবস্থাতেই গুরুত্ব পাচ্ছে 'পেরেন্টিং'-এর ভাবনা। পেরেন্টাল কনসালট্যান্ট পায়েল ঘোষ বলছেন, 'পেরেন্টিং নিয়ে বাবা-মায়েরা একটু সচেতন হলে অনেক সমস্যা সহজের দূর করা যায়। এটি মূলত চার রকমের। প্রথমে অথোরেটেটিভ পেরেন্টিংয়ের কথায় আসি। এই ধরনের পেরেন্টিং স্টাইলে প্রচুর নিয়মানুবর্তিতার ঘেরাটোপে ছেলে-মেয়েরা বড় হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা জানতে পারে না কেন নিয়মগুলো তৈরি হয়েছে। তাই ছেলেমেয়েদের বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাবা-মায়ের প্রতি ক্ষোভ জন্মায়। পাশাপাশি অনেক সময় ছেলেমেয়েরা লাগামহীন জীবন কাটানোর একটা অজানা আকর্ষণ অনুভব করে।' পাশাপাশি থাকছে পারমিসিভ এবং ডিসকানেক্টেড পেরেন্টিংয়ের বিষয়টিও।